বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ

ম. জাভেদ ইকবাল

ঢাকার গুলিস্তান-গাবতলী-সাভার-নবীনগর রুটের বাস চালক জয়নাল গাজী। এ পথে বাস চালিয়ে ১৮ বছরের বেশি সময় পার করেছেন। একসময় সাভার এলাকায় থ্রি-হুইলার অটো রিক্সা চালাতেন। তবে সংসারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করে প্রথমে কিছুদিন বাসের হেলপার ও পরে পুরোদোস্তুর চালক হয়ে ওঠেন তিনি। তারপর কেটে গেছে এতটি বছর। এ পেশার আয় থেকেই সাভারে নিজের জায়গাতে পাকা ঘর করে বাবা-মা আর সন্তান-সন্ততি নিয়ে ভালোই আছেন। তবে কিছুদিন হলো বাস চালানোর সময় ও রাতের বেলা দম বন্ধ হয়ে আসার অনুভূতি হয় তার। গত সপ্তাহে শ্যামলী বাসস্ট্যান্ডে থেমে যাত্রী ওঠানোর সময় এমনটি হওয়ার পর জ্ঞান হারান তিনি। বাসের হেলপার আর সুপারভাইজার মিলে জয়নালকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর সপ্তাহ জুড়ে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট এবং বক্ষব্যাধি হাসপাতালে নানা পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায় অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপের সাথে তিনি ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজে (সিওপিডি) ভুগছেন। এটি হলো ফুসফুসের রোগ যা একজন ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। সিওপিডি-তে আক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে অসুবিধা হয় এবং রোগের প্রকোপ বাড়ার সাথে সাথে দৈনন্দিন কাজ করাও অনেকাংশে কঠিন হয়ে যেতে পারে। দীর্ঘদিন তীব্র শব্দ ও বায়ু দূষণের মাঝে থাকার ফলে জয়নাল এরকম একাধিক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারেন বলে ডাক্তার জানান। যেহেতু যানবাহনের ধোঁয়া ও ধুলো-বালিতে পূর্ণ দূষিত বাতাসে কাজ করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়, সেহেতু এ পেশায় তো বটেই অন্য কোনো কাজেও যুক্ত হওয়া তার পক্ষে কঠিন। ডাক্তারের কথায় দুশ্চিন্তার বোঝা যেন তার মাথায় নেমে এলো। ঢাকা থেকে সাভারে ফেরার পথে বাসের জানালা দিয়ে বাস-ট্রাকের কালো ধোঁয়া, ডাস্টবিনের ময়লার স্তুপ, আমিনবাজার ব্রিজের নিচে বুড়িগঙ্গা-তুরাগের দূষিত কালো পানির স্রোত কোনো কিছুই আজকে তার নজর এড়ালো না। আমিন বাজারের স্যানিটারি ল্যান্ডফিল তথা ময়লার ভাগাড় এলাকায় দম বন্ধ হয়ে এলো তার। ছলছল চোখে জয়নাল ভাবলেন কোনো পৃথিবীর পথে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা আর আমাদের উত্তর প্রজন্ম।

আমরা যদি একটি পৃথিবীর কথা কল্পনা করি যা বৃক্ষহীন, জলাভূমিহীন এবং বৃষ্টিশূন্য, প্রথমেই যা মাথায় আসবে তা হলো ধূসর, জীবনবিহীন একটি গ্রহ, যেখানে প্রাণের কোনো অস্তিত্ব নেই। মানুষের স্বেচ্ছাচারিতায় আমাদের পৃথিবী হয়তো সে পথেই হাঁটছে। আদিম মানুষ প্রকৃতির সাথে সমন্বয় রেখে জীবনযাপন করতো। কিন্তু সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানুষ নিজের হাতে এই প্রকৃতির সমন্বয় নষ্ট করে নতুন সব প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটিয়েছে। ফলে প্রতিনিয়ত প্রকৃতি তার নিজের ভারসাম্য হারিয়ে মারাত্মক দূষণের শিকার হচ্ছে।

সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে পৃথিবীর বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ এখন ৪১৫ পিপিএম যা মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এখনই যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে দিনদিন এর পরিমাণ বাড়তে থাকবে। বাংলাদেশের কথা ধরলে, গত বছর এপ্রিল মাসে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে তাপমাত্রা পার করে এসেছে দেশ, যার প্রভাবে পশু-পাখিসহ মানব জীবন হয়ে উঠেছে দূর্বিষহ। সেসময় শ্রমজীবী মানুষের কষ্ট চোখে দেখার মত ছিল না। শুধু যে গরম তাই নয়, গত কয়েক বছরে প্রকৃতি অস্বাভাবিক আচরণ করছে। শীতকালে শীত নেই, বর্ষাকালে বৃষ্টি নেই। এর সাথে যুক্ত হয়েছে তীব্র বায়ুদূষণ। বাংলাদেশের নাম এখন প্রতিনিয়ত আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে উঠে আসে, সেটি বায়ুদূষণে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানে থাকার জন্য। বিশ্বব্যাংকের এক জরিপে দৃশ্যমান হয়েছে দেশের মানুষের মৃত্যুর প্রায় ৩২ শতাংশ নাকি দূষণ প্রক্রিয়ার পরিণতি। আজকের পরিবেশে এই অস্বাভাবিকতার জন্য মানুষের কৃতকর্মই দায়ী বলা চলে। নির্বিচারে আমরা সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত এক অমূল্য উপহার- প্রকৃতির বিনাশ করছি, এতে বিভিন্ন প্রাণীকূলসহ মানব সভ্যতা প্রকৃতির রোষানলে পড়ছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য এখন আর ঠিক নেই। বাংলাদেশের ষড়ঋতু যেন হারিয়ে গিয়েছে বছরজুড়ে তীব্র দাবদাহের ডামাডোলে।

বাংলাদেশে পরিবেশগত শব্দদূষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, যা জনগণের স্বাস্থ্য এবং সুস্থ থাকাকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করছে। সম্প্রতি ঢাকা মহানগরকে বিশ্বব্যাপী ৬১টি সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ নগরীর মধ্যে সবচেয়ে শব্দ দূষিত শহর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির (ইউএনইপি) একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ঢাকার গড় শব্দের মাত্রা ১১৯ ডেসিবেল পর্যন্ত পৌঁছেছে, যা সহনীয় মানের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি। এই দীর্ঘস্থায়ী শব্দদূষণ শহরের বাসিন্দাদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে, যেখানে রাজধানী ঢাকার ৬৫ শতাংশ ট্রাফিক পুলিশ দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ শব্দমাত্রার কারণে শ্রবণ ও ঘুমের ব্যাঘাতজনিত সমস্যায় ভোগার কথা জানিয়েছেন। দীর্ঘস্থায়ী শব্দের প্রভাবজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি সঠিকভাবে নথিভুক্ত হয়েছে; যেমন বিরক্তি, ঘুমের ব্যাঘাত এবং আরও গুরুতর পরিণতি যথা, হৃদরোগ এবং বিপাকীয় ব্যাধি। সেই সঙ্গে শিশুদের শব্দদূষণে দীর্ঘকালীন উপস্থিতি তাদের মধ্যে জ্ঞানসংক্রান্ত ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

দ্য বাংলাদেশ কান্ট্রি এনভায়রেন্টমেন্ট অ্যানালাইসিস (সিইএ) নামের এ রিপোর্ট অনুযায়ী বায়ু দূষণ, অনিরাপদ পানি, নিম্নমানের স্যানিটেশন ও হাইজিন এবং সীসা দূষণ বছরে দুই লাখ ৭২ হাজারের বেশি অকালমৃত্যুর কারণ এবং এর ফলে বছরে ৫.২ বিলিয়ন দিন অসুস্থতায় অতিবাহিত হয়। এসব পরিবেশগত কারণে ২০১৯ সালে বাংলাদেশের জিডিপির ১৭.৬ শতাংশ সমপরিমাণ ক্ষতি হয়েছে। ঘরের এবং বাইরের বায়ু দূষণ স্বাস্থ্যের ওপর সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে, যা ৫৫ শতাংশ অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী এবং যা ২০১৯ সালের জিডিপির ৮.৩২ শতাংশের সমপরিমাণ।

বাংলাদেশে ইমার্জিং পলিউট্যান্টের কারণে জনস্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। ঝুঁকি কমানোর জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ পলিউট্যান্টের প্রভাব কমানোর জন্য কিছু কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে। বর্জ্য পানি শোধনাগারগুলোকে

আরও আধুনিক ও কার্যকর করতে হবে। এতে ফার্মাসিউটিক্যালস, শিল্প রাসায়নিক ও মাইক্রোপ্লাস্টিকগুলোকে পানিতে প্রবেশ থেকে প্রতিরোধ করা যাবে। উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বর্জ্যগুলোকে সঠিকভাবে শোধন ও নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে, যা পরিবেশে দূষণ জনশিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে ইমার্জিং পলিউট্যান্টের বিপদ সম্পর্কে জানানো এবং প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো, ফার্মাসিউটিক্যাল বর্জ্য সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করা এবং কৃষিখেতে কীটনাশকের ব্যবহার কমানোর মতো টেকসই অনুশীলনের দিকে উৎসাহিত করা যেতে পারে। ইমার্জিং পলিউট্যান্টের প্রভাব এবং মানবস্বাস্থ্যের ওপর তাদের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা বাড়ানো জরুরি। মোট কথা, দূষণের প্রভাব কমানোর জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন, কঠোর নীতিমালা প্রয়োগ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং গবেষণার ওপর জোর দিতে হবে, যাতে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখা যায়।

প্লাস্টিক দূষণ পরিবেশগত অবনতি, জনস্বাস্থ্যগত ঝুঁকি এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। সেই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন ও বাস্তুতন্ত্রের অকার্যকারিতার ক্ষেত্রে এর ক্ষতিকর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। বিশ্বব্যাংকের ২০২১ সালের তথ্য অনুযায়ী, প্রধানত অপ্রতুল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কারণে বাংলাদেশ প্লাস্টিক দূষণের শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে স্থান পেয়েছে। ঢাকায় বার্ষিক মাথাপিছু প্লাস্টিক ব্যবহারের পরিমাণ ২২ দশমিক ২৫ কেজি, যা গ্রামীণ এলাকার চেয়ে তিন গুণ বেশি। এটি শহর অঞ্চলের পরিবেশের জন্য অসামঞ্জস্যপূর্ণ চাপের ইঙ্গিত বহন করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্লাস্টিক ব্যাগ নিষিদ্ধ করার মতো প্রশংসনীয় অগ্রগতি সত্ত্বেও এই উদ্যোগগুলোর কার্যকারিতা প্রায়ই বাস্তবায়নগত দুর্বলতার কারণে হ্রাস পেয়েছে। যখন বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করছে, তখন এই মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি এ সংকট আরও বাড়িয়ে দেয় এবং পরিবেশগত ক্ষতি ত্বরান্বিত করে। একটি সম্পূর্ণ প্লাস্টিক মুক্ত ভবিষ্যৎ হয়তো বাস্তবসম্মত বা কাঙ্ক্ষিত নাও হতে পারে, তবে সুস্থজীবনের জন্য আমরা আশাবাদী হতে পারি।

সিসাদূষণও একটি ব্যাপক বৈশ্বিক সমস্যা, যা লাখ লাখ মানুষের ওপর প্রভাব ফেলে এবং বাংলাদেশে এটি জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য একটি ক্রমবর্ধমান হুমকি তৈরি করছে। তিন চাকার বৈদ্যুতিক যানবাহনের (যেমন ইজিবাইক ও ই-রিকশা) দ্রুত প্রসার শহরে গতিশীলতায় বিপ্লব ঘটিয়েছে, যেখানে প্রতিদিন তিন থেকে চার মিলিয়ন যানবা এক কোটির বেশি যাত্রী পরিবহণ করে, যা বিশ্বব্যাপী টেসলা বহরের চেয়ে বেশি। যাই হোক, এই যানগুলোকে চালনার শক্তি দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত সিসা-অ্যাসিড ব্যাটারির (এলএবি) ওপর নির্ভরতা গুরুতর পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যগত চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। স্বাস্থ্য বিষয়ক ‘দ্য ল্যানসেট’ জার্নালের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের প্রতি তিনজন শিশুর মধ্যে দুইজনের রক্তে উচ্চমাত্রায় সিসা রয়েছে, যা তাদের জ্ঞানীয় উন্নয়ন, মনোযোগ এবং শিক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। সিসা বিষক্রিয়া আইকিউ স্তর হ্রাস করে, আয়ের সম্ভাবনা এবং জীবনযাত্রার মান কমিয়ে দেয়।

বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও প্লাস্টিক, শব্দ এবং সিসাদূষণ মোকাবিলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উদ্ভাবন এবং স্বাস্থ্যকর জীবনধারার দিকে নিয়ে যেতে পারে। টেকসই বিকল্পের মাধ্যমে প্লাস্টিক প্রতিস্থাপন, উন্নত স্বাস্থ্যের জন্য শব্দ হ্রাস এবং বৈদ্যুতিক যানবাহন খাতের রূপান্তর সম্মিলিতভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তনে ও অগ্রগতিসাধনে সহায়ক হতে পারে।

উন্নয়নের মহাসড়কে যাত্রা করতে গিয়ে আমরা আসলে কতখানি পিছিয়ে যাচ্ছি তা বোঝা যায়, যখন দেখি বর্তমানে দেশে জনপ্রতি বনভূমির পরিমাণ প্রায় দশমিক শূন্য দুই হেক্টর মাত্র। আমরা যদি অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশে প্রকৃতিকে না রেখে উন্নয়নের মিছিলে অংশগ্রহণ করি তবে সেই উন্নয়ন মানব সভ্যতার জন্য কতটা যৌক্তিক হবে সেটা বিবেচনার বিষয়। প্রায়শই দেখি গাছ কেটে, জলাশয় ভরাট করে, খেলার মাঠ দখল করে উন্নয়নের কাজ চলছে। যেখানে তৈরি করা হচ্ছে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত বহুতলভবন, আবাসিক হোটেল, সোসাইটি এবং সুপারমার্কেট। কয়েকদিন আগে বিশ্ব নেতাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো জলবায়ুবিষয়ক (কপ-২৭) সম্মেলন। নানা ধরনের সমীক্ষা, গবেষণা প্রতিবেদন, সেমিনার, আলোচনা এবং বক্তৃতা সম্মেলনে উঠে এসেছে। বিশ্বের যেসব দেশ জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে, বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। তাই পরিবেশ দূষণ নিয়ে আমাদের ভাবনার সময় এসছে। অপেক্ষা না করে আমাদের সচেতন হতে হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষার জন্য।

#

লেখক: সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার, পিআইডি, ঢাকা।

পিআইডি ফিচার